আত্মপরিচয়

বিনয় মজুমদার

আত্মপরিচয়
বিনয় মজুমদার

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৪
দ্বিতীয় সংস্করণ : জুন ২০১৬
তৃতীয় মুদ্রণ : জুলাই ২০২৩

প্রকাশক
সজল আহমেদ কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম বেইজমেন্ট
২৫৩-২৫৪ ড. কুদরত-ই-খুদা রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
সব্যসাচী হাজরা

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস ৪৮৩-৪৮৬ গাউসুল আজম সুপার মার্কেট নীলক্ষেত ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে বুকস অফ বেঙ্গল বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং কলকাতা

মূল্য : ১২৫ টাকা

Attaparichai by Binoy Majumder Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market 253-254 Dr. Kudra-E-Khuda Road Kantabon Dhaka 1205
Third Edition: July 2023
Phone: 02-44617335 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 125 Taka RS: 125 US 5 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-90757-6-9

ঘরে বসে কবি প্রকাশনী'র যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

আত্মপরিচয় : প্রথম পর্ব

কৈশোর থেকেই আমি কবিতা লিখতে শুরু করি, প্রথম কবিতা যখন লিখি তখন আমার বয়স তেরো বছর। নানা করণে এই ঘটনাটি আমার এখনো স্পষ্ট মনে আছে। কবিতাটির বিষয়বস্তু ছিলো এই : এক পালোয়ান বাজি ধ'রে একটি চলন্ত মোটর গাড়িকে টেনে পেছিয়ে নিয়ে এলো। এর পরেও আমি মাঝে মাঝে কবিতা লিখতাম। কিন্তু ষোলো-সতেরো বছর বয়স পর্যন্ত কী লিখেছিলাম, কবিতাগুলির দশা কী হয়েছিলো কিছুই এখন আর মনে নেই। তখন কলকাতার স্কুলে পড়ি। মাস্টারমশাইরা ঘোষণা করলেন স্কুলের একটি ম্যাগাজিন বেরোবে। ছাত্রদের কাছে লেখা চাইলেন। আমি একটি কবিতা লিখে ফেললাম; তার একটি পঙ্‌ক্তি এখনো মনে আছে—'ভিজে ভারি হলো বেপথু যুথীর পুষ্পসার'। মাস্টারমশাই-এর হাতে নিয়ে দিলাম। তিনি প'ড়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন। কিন্তু, কী জানি কেন, সে ম্যাগাজিন আর শেষ পর্যন্ত বেরোলো না। এর পরবর্তী সময়কার কবিতা লেখার ব্যাপার একটু বিশদভাবেই আমার মনে আছে।

স্কুল ছেড়ে কলেজে এসে ভর্তি হলাম। এবং আমার কবিতা লেখার পরিমাণও কিছু বাড়লো। আমার একটি খাতা ছিলো। ডবল ক্রাউন সাইজের, চামড়ায় বাঁধানো, কাগজের রঙ ইটের রঙের মতো। খাতাটি খুব মোটা। আমার সব লেখাই এই খাতায় লিখতাম। স্কুলে কবিতা লিখতাম ক্বচিৎ কদাচিৎ। কিন্তু কলেজে উঠে নিয়মিত লিখতে শুরু করি। লিখতাম বেশ গোপনে গোপনে, যাতে কেউ টের না পায়। কারণ আমি কবিতা লিখি—এ-কথা কেউ বললে খুব লজ্জা হতো আমার। কলেজের

হোস্টেলে থাকতাম। ফলে অন্যান্য আবাসিকরা শীঘ্রই জেনে ফেললো যে আমি কবিতা লিখি। আমার ঘরে দুটি সিট ছিল। আমার রুম-মেটই বোধ হয় ফাঁস ক'রে দিয়েছিল খবরটা। আমাদের রান্নাঘরের দেওয়ালে একটি নোটিশ বোর্ড লাগানো ছিলো। হোস্টেল কর্তৃপক্ষের নোটিশগুলি ঐ বোর্ডে আঠা সেঁটে দিয়ে দেওয়া হতো। কিছুদিনের ভিতরেই ঐ নোটিস বোর্ডে আমার লেখা কবিতাও সেঁটে দিতে লাগলাম—সবগুলিরই বিষয়বস্তু হোস্টেলে খাবার-দাবার সম্বন্ধে ছাত্রদের অভিযোগ। সবই হস্টেলের সহকারী সুপারিনটেনডেন্ট সম্পর্কে লেখা ব্যঙ্গ কবিতা। প'ড়ে ছাত্ররা কিংবা সুপারিনটেনডেন্ট যে প্রশংসা করতো তা নয়। ডালে কেন ডাল প্রায় থাকে না, কেবল জল, মাংস কেন ঘন ঘন খেতে দেওয়া হয় না–এই সবই ছিলো নোটিস বোর্ডে সাঁটা কবিতার বিষয়বস্তু। আমার অন্য কবিতা গোপন ক'রে রাখতাম।

কলেজে একটি দেয়ালপত্রিকা ছিলো। খুব সুন্দর হাতের লেখায় শোভিত হয়ে পত্রিকাটি নিয়মিত বেরোতো। হস্টেলে আমি ভিন্ন আর কেউ কবিতা লিখতো না, কিন্তু কলেজে লিখতেন অনেকে। তাঁদের লেখা মাঝে মাঝে কলেজের দেয়ালপত্রিকায় প্রকাশিত হতো। আমার লেখা কবিতা কিন্তু কখনো এ-দেওয়াল পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি। কলেজের একটি ছাপা বার্ষিক সাহিত্য সঙ্কলনও ছিলো। তাতেও আমার কবিতা কখনো প্রকাশিত হয়নি।

সেই সময়ে আমার সব কবিতায় মিল থাকতো। মিলগুলি অনায়াসে মন থেকে বেরিয়ে আসতো। তার জন্য একটুও ভাবতে হতো না। কবিতা যখন লিখতাম তখন মনে হতো আগে থেকে মুখস্থ করা কবিতা লিখে যাচ্ছি, এত দ্রুত গতিতে লিখতে পারতাম। এক পয়ার ভিন্ন অন্য সব ছন্দেই লিখতাম। কবিতাগুলির বিষয়বস্তুও ছিলো বিচিত্র, প্রায় সবই কাল্পনিক। দু-একটা বিষয়বস্তুর অংশ আমার এখনো মনে আছে—চিল্কা হ্রদের ধারে এক সঙ্গিনীসহ ব'সে ব'সে চারিপাশে নিসর্গকে দেখছি বা এক সঙ্গিনীসহ মোটর গাড়িতে ক'রে খুব দ্রুতবেগে চলেছি, মনে হচ্ছে গাড়িটি পৃথিবীর একটি উপগ্রহবিশেষ বা ট্রেনে ক'রে দৈনিক লক্ষ লক্ষ কেরানি

কী-ভাবে চাকুরি করতে কলকাতায় আসে ইত্যাদি ইত্যাদি। সেই সময়ে লেখা কবিতাগুলি খুব দীর্ঘ হতো। ছোট কবিতা আমি প্রায় লিখতে পারতাম না।

এবার একটু আগের কথা লিখে নিই। আমি যখন দশম শ্রেণিতে পড়ি, মনে হচ্ছে, তখনি সিগনেট বুকশপ নামক দোকানটি সবে খুললো। আমি তখন দৈনিকই বিকেলবেলায় ঐ দোকানের সামনে দিয়ে হেঁটে যেতাম। তখন দোকানের মালিক দিলীপবাবু নিজেই দোকানে ব'সে বই বিক্রি করতেন। কী ক'রে যে তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়ে গেলো ঠিক মনে নেই। বোধ হয় বই কিনতে গিয়েই আলাপটা হয়েছিলো। আমি প্রায় দৈনিক একখানা ক'রে কবিতার বই তাঁর কাছ থেকে কিনতাম। রবীন্দ্রোত্তর যুগের বাছা বাছা কবিদের বই অনেক কিনে ফেললাম, প'ড়েও ফেললাম সব। অথচ কোনো কারণে, সে বইগুলি মনে বিশেষ সাড়া জাগাতো না। বয়স কম ব'লেই হয়তো অমন হতো।

যাই হোক, ইংরেজি ক্ল্যাসিক্যাল কবিদের বই আমি প্রায়শই লাইব্রেরি থেকে এনে পড়তাম। সেই বয়সে তাঁদের কবিতা আমার ততো ভালো লাগতো না। আবার মনে হচ্ছে, বয়স কম ব'লে অমন হতো—একথা বোধহয় ঠিক লিখিনি। কারণ তখন রবীন্দ্রনাথের কাব্যগুলির মধ্যে আমার ভালো লেগেছিলো 'প্রান্তিক' নামক ছোটো বইখানি। এখনো আমার ঐ বইখানিই সবচেয়ে ভালো লাগে। বয়স বাড়ার ফলে আমার সে অল্প বয়সের ভালোলাগা পাল্টায়নি। যা হোক, আমি নিজে কী লিখতাম সেইটেই এ প্রবন্ধের বিষয়বস্তু। 'বিষয়বস্তু' লিখেই মনে পড়লো কবিতা লেখার অন্যতম প্রধান ব্যাপার হচ্ছে একটি ভালো বিষয়বস্তু মনে আসা। তখনকার বিষয়বস্তু ছিলো অধিকাংশ কাল্পনিক—এ-কথা আগেই লিখেছি। শহরের দৃশ্যাবলী–পথ ঘাট মাঠ বাড়ি—এ-সকল আমার কবিতার বিষয়বস্তুতে আসতো না। মাঝে মাঝে গ্রামে আসতাম। গ্রামের দৃশ্যাবলীও আমার বিষয় বস্তু হতো না। অর্থাৎ কেবল বর্ণনামূলক কবিতা আমি সেই বয়সেই লিখতে পারতাম না। এতদিন পরে এখন কিছু কিছু লিখতে পারি। এ-প্রসঙ্গে পরে আবার আসবো।

ইতিমধ্যে কলেজ পালটে অন্য এক কলেজে চ'লে যেতে হলো। সেখানে বিজ্ঞান বিষয়ে পড়াশুনা করতে হতো। সেখানে কলেজের পড়াশুনায় এত বেশি সময় দিতে হতো যে অন্য কোনো বিষয়ে মনোনিবেশ করার সময় পাওয়া যেতো না। ফলে বছর দুয়েক আমার কবিতা লেখা বন্ধ থাকলো। গঙ্গার ধারে কলেজ, পাশেই বোটানিক্যাল গার্ডেন। নদীর পাড়ে বিরাট এক কাঠগোলা। আন্দামান থেকে জলপথে নিয়ে আসা বিশাল বিশাল সব কাঠের গুঁড়িতে নদীর পাড় ঢাকা। সেখান থেকে গঙ্গার দৃশ্য অপূর্ব। কিন্তু কেবল বর্ণনামূলক কবিতা আমি তখনো লিখতে শিখিনি। ফলে সেই কলেজে থাকাটা আমার কাব্যচর্চার ভিতরে বিশেষ স্থান পায়নি। সেই কলেজে ছিলাম চার বছর—ছাত্রাবাসে। তার প্রথম দু-বছর কবিতা লেখার সময়ই পাইনি। শেষ দু-বছর কিছু কিছু সময় পেতাম এবং মাঝে মাঝে লিখতাম। কাপড়ে বাঁধানো রয়াল সাইজের একটা প্রকাণ্ড ডায়েরি আমি যোগাড় করছিলাম। তাতেই কবিতা লিখতাম। অন্যান্য বিজ্ঞান বিষয়েও লিখতাম ঐ একই খাতাতে। এক পয়ার বাদ দিয়ে অন্য সকল ছন্দে আমি অনায়াসে লিখতাম। মিল দিতে বিশেষ বেগ পেতে হতো না। মিল যেন আপনিই এসে যেতো। এই কলেজে আসার পর আমি পয়ারে কবিতা লেখার চেষ্টা করতাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় নির্ভুল পয়ার আমি একবারও লিখতে পারতাম না। কোথায় ভুল হচ্ছে সেটি স্পষ্ট টের পেতাম। কিন্তু সে-ভুল শোধরাবার কোনো উপায় খুঁজে পেতাম না। তখন থেকে শুরু ক'রে চার বছর লেগেছিলো আমার পয়ার লেখা শিখতে—'আবিষ্কার করতে' লেখাটাই ঠিক ছিলো মনে হচ্ছে। এবং ১৯৬০ সালের শুরুতে আমি পয়ার লেখার নিখুঁত পদ্ধতি আবিষ্কার করি। তারপর পয়ার ভিন্ন অন্য কোনো ছন্দ লিখিইনি। এখন পয়ারই আমার প্রিয়তম ছন্দ। শুধু পয়ারই লিখি।[১]

নানা কারণে এখন আমার মনে হয় কেউ নিখুঁত পয়ার লিখতে পারলেই তাকে কবি ব'লে স্বীকার করা যায়, স্বীকার করা উচিত।

যাই হোক, সেই বয়সের কথায় ফিরে যাই। আমাদের কলেজ থেকে ছাত্রদের সম্পাদনায় একটি বার্ষিক সাহিত্য সঙ্কলন বেরোতো। তাতে

আমার লেখা কবিতা চেয়ে চেয়ে নিতো। গোটা কয়েক কবিতা ছেপেছিলো। এই কলেজে পাঠকালে লেখা কবিতায় কাটাকুটি আবির্ভূত হয়। আগে কাটাকুটি করার বিশেষ দরকার হতো না। এবার দরকার হতে লাগলো। কবিতায় অলঙ্কার বলতে আগে দিতাম শুধু উপমা। এবার কবিতায় উপমার সঙ্গে-সঙ্গে প্রতীকও ব্যবহার করতে লাগলাম। সে-সময়কার কবিতার খাতাগুলি আমি সব হারিয়ে ফেলেছি। আমার যতদূর মনে পড়ে ঐ কলেজে চার বছরব্যাপী পড়ার সময় আমি গোটা পঞ্চাশ কবিতা লিখেছিলাম। শুধু যে সময়াভাব এর জন্য দায়ী তা নয়, কাব্যিক বিষয়বস্তুর অভাবও এর জন্য দায়ী। অনেক পরে আমি যে-কোনো বিষয়বস্তু নিয়ে কবিতা লেখার পদ্ধতি আবিষ্কার করি। অনেক পরে শক্তি চট্টোপাধ্যায় আমার বইয়ের এক সমালোচনায় লিখেছিলো যে আমি যে-কোনো বিষয় নিয়ে কবিতা লিখতে পারি, এমন কি 'গু গোবর' নিয়েও আমি সার্থক কবিতা লিখতে পারি। কিন্তু তখনো অবস্থা এমন হয়নি। সেই কলেজে পাঠকালে ভাবতাম কিছু বিষয়বস্তু কাব্যিক, আর কিছু বিষয়বস্তু কাব্যিক নয়। এখন আমার মনে হয় ব্যাপারটা তেমন নয়। সব বিষয়বস্তুই কাব্যিক এবং যাঁর দৃষ্টিতে এই কাব্যিকতা ধরা পড়ে, তিনিই কবি। এমন কি, চিন্তা করার নির্দিষ্ট পদ্ধতি আছে যে-পদ্ধতিতে ভাবলে কাব্যিকতা বেরিয়ে আসতে বাধ্য হয়। বিষয়বস্তুর মধ্যে কাব্যিকতা লুকিয়ে থাকে, তাকে বের করার জন্য চিন্তার সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি আছে। এ-সব কথা আমি টের পাই, বুঝতে পারি ১৯৬০ খৃস্টাব্দের গোড়া থেকে। তার আগে জানতাম না।

যাই হোক, ১৯৫৭ সালও শেষ হলো, আমার কলেজ পড়াও শেষ হলো। পঠদ্দশা শেষ হয়ে গেলো। কলেজের ছাত্রাবাস ত্যাগ ক'রে আমি শেষ অবধি কলকাতায় চ'লে এলাম।

এই সময় কুশল মিত্র নামক এক কবির সঙ্গে আমার আলাপ হয়। তাঁর প্রথম কবিতার বই তখন সবে বেরিয়েছে। যেদিন বেরোলো সে-দিন তিনি বললেন, 'চলুন মিষ্টির দোকানে, আপনাকে মিষ্টি খাওয়াই।' এঁর বইয়ের প্রকাশক দেবকুমার বসুর সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিলেন। অধুনালুপ্ত 'গ্রন্থজগৎ' দোকানটি ছিলো দেবকুমার বসুর। আমি মাঝে মাঝে

দেবকুমার বাবুর দোকানে গিয়ে ব'সে থাকতাম। আমি স্থির করলাম আমারো একখানি বই প্রকাশ করা দরকার।

কলকাতায় তখন নিজেকে একেবারে নবাগত ব'লে মনে হতে লাগলো। কফির আসরে, আড্ডাখানাগুলিতে আমি যেতাম আমার অফিস ছুটি হলে পর। দেখতাম আলোচনার বিষয় সর্বত্রই সাহিত্য এবং রাজনীতি। অথচ বাংলা সাহিত্যের খবর আমি তখন তেমন রাখতাম না। রাখার সুযোগই হয়নি ইতিপূর্বে। ফলে আলোচনায় যোগদান করা আমার হতো না। চুপচাপ ব'সে শুনতাম কে কী বলে। তারপর ভাবলাম আর কিছু না হোক লোকজনের সঙ্গে মেশার জন্যই তখনকার আধুনিক কাব্য সাহিত্যে কিছু পড়া ভালো। কোথায় কে কী লিখেছে তার একটু খোঁজ রাখা ভালো। ফলে কিছু পড়াশুনা শুরু করলাম। এই সময়ে 'দিগ্‌দর্শন' নামে একটি পত্রিকার সম্পাদক-এর সঙ্গে আমার জানাশোনা হয়। তিনি আমার কাছ থেকে কিছু অনুবাদ চেয়ে নিয়ে তাঁর পত্রিকায় প্রকাশ করলেন। অনুবাদগুলি কবিতার নয়, গদ্যের।

এই সময়ে মোহিত চট্টোপাধ্যায় ও অমিতাভ চট্টোপধ্যায়ের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। তাঁরা তখন কবিরূপে অল্প পরিচিত। মোহিতবাবু তখন এম.এ. পড়তেন। আমি তখন সাহিত্য বিষয়ে আলোচনায় মোটামুটি যোগদান করতে শিখেছি। আমার কোনো কবিতা আমি কোনো পত্রিকায় পাঠাতাম না। আপন মনে লিখে খাতাতেই রেখে দিতাম। দেবকুমার বসু আমার কবিতার বই প্রকাশ করতে রাজি হলেন। আমি তখন আমার পুরোনো কবিতার খাতা ফের পড়তে লাগলাম। প'ড়ে মনে হলো, গোটা পঞ্চাশ কবিতার মধ্যে কবিতাপদবাচ্য বলা যায় গোটা পাঁচেককে। মনটা খুব দমে গেলো। তখন নতুন কিছু লিখতে গেলাম। সব পয়ারে। বাছাই ইত্যাদি করে অতি ছোট একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করা যায় ব'লে দেখা গেলো। দেবকুমারবাবু অতি সজ্জন। তিনি বললেন, 'চলুন দেবুদার কাছে, মলাট এঁকে নিয়ে আসি।' চললাম তাঁর সঙ্গে দেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে, বেলেঘাটায়। কাঁটা লঙ্কা দিয়ে মুড়ি খেতে খেতে তিনি একটা ছবি এঁকে দিলেন। অতি সুন্দর হলো দেখতে।

বই ছাপা হয়ে বেরোলো। মোটা ষাট পাউন্ড এ্যান্টিক কাগজে ছাপা। জানা-শোনা লোকদের কয়েকজনকে দিলাম পড়তে। কিন্তু কেউ আমার কবিতা সম্বন্ধে উচ্চবাচ্য সুরু করলো না, প্রশংসাও করলো না। দেবকুমারবাবু নিশ্চয়ই বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায়ও দিয়েছিলেন। কেউ ভালো ক'রে রিভিউও করলো না। সব চুপচাপ, যেন আমার বই প্রকাশিত হয়নি। এ বইয়ের নাম 'নক্ষত্রের আলোয়।'

দেবকুমারবাবুর মাধ্যমে আমার বহু তরুণ কবির সঙ্গে আলাপ হয়। তাঁরাও আমার বই সম্বন্ধে কোনো আলোচনা করতেন না। তবে এটা ঠিক যে লক্ষ্য ক'রে প'ড়ে দেখতাম অন্যান্য তরুণ কবির লেখা থেকে আমার লেখা ভিন্ন প্রকারের, এক রকম নয়। আমার কবিতা বেশ পুরোনো ধাঁচের, সেগুলিকে ঠিক আধুনিক কবিতা বলা চলে না।

এই সময় কবি বিষ্ণু দের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। কী ক'রে হয়েছিলো এখন আর তা মনে নেই। মোট কথা, মাঝে মাঝে সন্ধ্যার সময়ে তাঁর বাড়িতে যেতাম। কোনোদিন সঙ্গে কবিতার খাতা নিতাম। তিনি খাতা পড়ার জন্য রেখে দিতেন। তৎকালে 'সাহিত্যপত্র' নামক একটি পত্রিকা বেরোতো বিষ্ণুবাবুর তত্ত্বাবধানে। ঐ সাহিত্যপত্রে আমার একটি কি দুটি কবিতা তিনি ছেপে দিয়েছিলেন।

'নক্ষত্রের আলোয়' বইখানা পাঠক-সমালোচক মহলে সমাদৃত না-হলে আমি খুব ভাবিত হয়ে পড়লাম। অন্যান্য তরুণ কবির ঢঙে লেখা তো আর চাইলেই হয়ে ওঠে না। ফলে এরূপ চিন্তা আমি করতাম না। কলকাতার কোনো লিটল্ ম্যাগাজিনের সঙ্গে আমার যোগ তো দূরের কথা, জানাশোনাই ছিলো না। আমার বয়স তখন তেইশ চব্বিশ, ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে। এ যাবৎ লেখা আমার কবিতার অধিকাংশ বর্জন ক'রে মন খুব বিষণ্ন। এইভাবে ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দ চ'লে গেলো। ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দটি কোনো চাকুরি না-ক'রে শুয়ে শুয়েই কাটিয়ে দিলাম। এই সময়ে প্রচুর বিদেশি সাহিত্য পাঠ করি। ধীরে ধীরে আমার মনে কবিতা রচনার একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতি আবির্ভূত হয়।

এই ১৯৫৯ সালে আমায় বেশ কিছু অনুবাদ করতে হয়। পাইকপাড়া থেকে 'বক্তব্য' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হতো। সম্পাদক ছিলেন বিমান সিংহ। আমি থাকতাম গ্রামে; আমার গ্রামের ঠিকানায় তিনি প্রায়শই চিঠি দিতেন অনুবাদ কবিতা প্রার্থনা ক'রে। আমি অনুবাদ ক'রে পাঠাতাম এটা ঠিক। কিন্তু তিনি আমার নিজের লেখা কবিতা কেন চান না—এ ক্ষোভ আমার মনে মনে থাকতো। কিছু বিরক্তও বোধ করতাম। আমি যে কবিতা লিখি তা সে সম্পাদক জানতেন, 'নক্ষত্রের আলোয়' তিনি পড়েছিলেন। তবু কখনো আমার নিজের লেখা কবিতা চাইতেন না।

এরপর ১৯৬০ খৃস্টাব্দের একেবারে গোড়ার দিকে আমি স্থির করলাম সর্বান্তকরণে কবিতাই লিখি। চাকুরি আপাতত থাক। গ্রাম ছেড়ে কলকাতায় চ'লে গেলাম। সকালে জাগরণ থেকে শয়ন পর্যন্ত সারাক্ষণ কবিতাই ভাবতাম। আশপাশে শহরের যে দৃশ্যাবলী দেখতাম তার কোনো কিছু কাব্যিক মনে হলে তখনি নোট বুকে টুকে রাখতাম। ছোট আকারের কবিতার নোট বই সর্বদাই প্যান্টের পকেটে রাখতাম !

সৃষ্টির মূল যে সূত্রগুলি তা জড়ের মধ্যে প্রকাশিত, উদ্ভিদের মধ্যে প্রকাশিত, মানুষের মধ্যেও প্রকাশিত। এদের ভিতরে সূত্রগুলি পৃথক নয়, একই সূত্র তিনের ভিতরে বিদ্যমান। এই সার সত্য সম্বল ক'রে ভেবে দেখলাম জড়ের জীবনে যা সত্য, মানুষের জীবনেও তাই সত্য, উদ্ভিদের জীবনে যা সত্য, মানুষের জীবনেও তাই সত্য। অতএব জড় এবং উদ্ভিদের জীবন অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করতে লাগলাম আমি। এবং তাদের জীবনের ঘটনাকে মানুষের জীবনের ঘটনা ব'লেই চালাতে লাগলাম। এইভাবে শুরু হলো কবিতার জগতে আমার পথযাত্রা, আমার নিজস্বতা। এইভাবে সৃষ্টি হলো 'গায়ত্রীকে', 'ফিরে এসো, চাকা'। ১৯৬০ সাল আমি এইভাবে লিখেই কাটালাম এবং দেবকুমার বসু মহাশয়কে ধরলাম প্রকাশ করার জন্য। এক ফর্মার একখানা পুস্তিকা প্রকাশ করা হবে ব'লে স্থির হলো।

ইতিমধ্যে আরো যা যা ঘটেছিলো তা লেখা ভালো। জনকয়েক অতি তরুণ কবির সঙ্গে তখন দৈনিকই আড্ডা দিতাম। এঁদের ভিতরে মোহিত

চট্টোপাধ্যায় একজন। যতদূর মনে পড়ছে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গেও এই সময়ে আলাপ হয়েছে, তার 'হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য' আমাকে উপহার দিয়েছিলো একখানা। সেখানা আমি পড়েছিলাম মনোযোগ দিয়ে। তখন 'আরো কবিতা পড়ুন' নামক আন্দোলন খুব জোর চলেছে। মাঝে মাঝে রাস্তা দিয়ে ছোট মিছিল যেতো। স্লোগান দিতো 'আরো কবিতা পড়ুন', হাতে থাকতো ফেস্টুন। যতদূর মনে পড়ে তখনকার সিনেট হলের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে তরুণ কবিরা বক্তৃতাও দিতো, পথচারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতো। দেখেশুনে আমি বলতাম, 'আমি এখন যা লিখছি সে হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক। তার মানে ভবিষ্যতে আমার কবিতা ছাত্রছাত্রীরা পড়তে বাধ্য হবে। সেহেতু এখন আমার কোনো পাঠক না-থাকলেও চলে।' এবং কবিবন্ধুদের বললাম যে মিছিল ক'রে কিছু হবে না। আসল কথা হচ্ছে ভালো লেখা দরকার। যখন কবিতার বই ছেপে খাটের নিচে রেখে দেবে, কারো কাছে বেচতে যাবে না, তা সত্ত্বেও পাঠকেরা এসে খাটের নিচ থেকে টেনে নিয়ে গিয়ে পড়বে তখনই বুঝবে কবিতা ঠিক লেখা হচ্ছে। আমার এ-মন্তব্য কিন্তু কবিবন্ধুদের ভালো লাগেনি।

অবশেষে সেই এক ফর্মা পুস্তিকা প্রকাশিত হলো। নাম 'গায়ত্রীকে'। চোদ্দটি কবিতা ছিলো তাতে। মোট ষোলো পৃষ্ঠার বই। আগেই ভেবেছিলাম যে দ্বিতীয় সংস্করণে আরো অনেক কবিতা যুক্ত ক'রে পুস্তিকাখানিকে একখানি পূর্ণাঙ্গ বই ক'রে ফেলবো। ফলে আমি লিখে চললাম। ইতিমধ্যে দুর্গাপুরে একটি চাকরি পেয়ে আমি কলকাতা ছেড়ে দুর্গাপুরে যাই। সেখানে তিন শিফটে কাজ করতে হতো। সকালের শিফট, সন্ধ্যার শিফট এবং রাতের শিফট। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এই তিন শিফটেই কাজ করতে হতো। কাজের ফাঁকে ফাঁকে আমি কবিতা লিখতাম। মাস আড়াই কাজ করার পর আমি 'গায়ত্রীকে' পুস্তিকাকে পরিবর্ধনের ব্যাপার শেষ ক'রে ফেলি। সাতাত্তরটি কবিতা সম্বলিত পাণ্ডুলিপি আমি দেবকুমার বাবুকে দিয়ে গেলাম। বইয়ের নাম দিলাম 'ফিরে এসো, চাকা'।

এর মধ্যে অবশ্য অন্য ব্যাপারও ঘ'টে গেছে। হাওড়া থেকে প্রকাশিত অশোক চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'সম্প্রতি' নামক পত্রিকায় 'গায়ত্রীকে'র সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছে। শক্তি চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলো। অতি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলো শক্তি। লিখেছিলো যে আমি যে-কোনো বস্তু নিয়ে সার্থক কবিতা লিখতে পারি। এবং আশ্চর্যের বিষয়, সমালোচনায় শক্তি লিখলো যে 'হাংরি জেনারেশন' নামে একটি কবিগোষ্ঠী গঠিত হয়েছে, আমিই তার জনক ইত্যাদি ইত্যাদি।[২] আসল কথা হচ্ছে ঐ সমালোচনা প'ড়েই আমি ঐ জেনারেশনের কথা জানলাম, তার আগে জানতাম না। জেনারেশনের অন্তর্ভুক্ত কারো সঙ্গেই তখন আমার আলাপ ছিলো না। দুর্গাপুরে কর্মরত থাকার ফলে কোনো দল গঠন ছিলো আমার পক্ষে অসম্ভব। আসল কথা দল গঠন ক'রে দিয়েছিলো শক্তি। তার নিজের কৃতিত্ব আমার ঘাড়ে চাপাতে চেয়েছিলো কেন কে জানে। শক্তির এই সমালোচনা প্রকাশিত হওয়া পর্যন্ত কোনো পত্রিকাতে আমার কবিতা কেউ চেয়ে নিতো না। সম্পাদকেরা চাইতো না এবং আমিও দিতাম না। ফলে এখন যদি কেউ আমার লেখার সন্ধানে পুরোনো পত্রিকা ঘাঁটেন তবে হতাশ হবেন। কবিতার জগতে আমার প্রবেশ পত্রিকায় কবিতা ছেপে নয়, বই ছেপে। কলকাতায় আর কোনো কবির জীবনে এরূপ হয়েছে কিনা জানি না। শক্তির সমালোচনা প্রকাশিত হওয়ার পর অবশ্য অবস্থা পরিবর্তিত হলো; লিট্‌ল ম্যাগাজিনের সম্পাদকেরা আমার কবিতা চেয়ে নিয়ে ছাপাতে লাগলেন। তবে সে অল্প সংখ্যক পত্রিকা। এর পরই বেরোলো 'ফিরে এসো, চাকা'। তখন আমি দুর্গাপুরের চাকরি ছেড়ে কলকাতায় ফিরে এসেছি। 'ফিরে এসো, চাকা' কলকাতায় ফেরার আগেই ছাপা হয়ে গেলো। ফলে আমি প্রুফ দেখতে পারিনি। অনেক ছাপার ভুল রয়ে গেছলো। যেমন 'শুভ্র গান' এর জায়গায় চাপা হয় 'শুভ গান'। অনেক জায়গায় শব্দও বাদ চ'লে গেলো। আর, কবিতায় শব্দ বাদ যাওয়া মানেই তো ছন্দপতন। শক্তিকে 'ফিরে এসো, চাকা' একখানা উপহার দিয়ে বললাম একটা সমালোচনা করতে। ও বলল, 'হ্যাঁ, নিশ্চয় করবো। তবে তোর বই কি কলকাতায় ব'সে পড়া যায় রে। অন্য পরিবেশ লাগে। তাই

বাসায় গিয়ে পড়বো তোর বই। তারপর লিখবো।' শক্তি আমাকে তখন তুই বলতো। সম্প্রতি দেখলাম তুই পালটে তুমি বলতে শুরু করেছে।

'গায়ত্রীকে' প্রকাশের সময় এবং 'ফিরে এসো, চাকা' প্রকাশের সময়ের মাঝখানে খুব অল্প কটি কবিতা পত্রিকায় বেরিয়েছিলো। সবই লিট্‌ল ম্যাগাজিনে।

এসব হচ্ছে ১৯৬২ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বরের ঘটনা। এরপর ১৯৬৩ সালের নভেম্বর পর্যন্ত একবছর আমি কোনো কবিতা লিখিনি। গ্রামে থাকতাম।

শক্তি তার প্রতিশ্রুতি রেখেছিলো। বেশ দীর্ঘ একটি সমালোচনা লিখেছিলো 'ফিরে এসো, চাকা'র।[৪] ১৯৬৩ সালে। ওর সমালোচনার ফলে হৈ-চৈ প'ড়ে গেলো কলকাতায়। ১৯৬৩ সালের নভেম্বর কি ডিসেম্বরে আমি ফিরে গেলাম কলকাতায়। শক্তি একদিন একখানি চটি পত্রিকা টেবিলে রেখে বললো, 'এই হলো কৃত্তিবাস। তোর কবিতা দে, কৃত্তিবাসে ছাপবো।' তার আগে 'কৃত্তিবাস' আমি কোনোদিন চোখে দেখিনি, নাম শুনেছিলাম অবশ্য। আমি বললাম 'আমি তো কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়েছি। ফলে দেবার উপায় নেই।' উত্তরে শক্তি বললো, 'তুই না-লিখলে 'কৃত্তিবাস' বারই করবো না আর, বন্ধ ক'রে দেবো। তুই তাড়াতাড়ি কবিতা লিখা দে।' চাপে প'ড়ে আমি রাজি হলাম লিখতে। এইভাবে ১৯৬৪ সালে 'কৃত্তিবাস'-এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ি।

১৯৬৪ সালের গোড়াতেই লক্ষ্য করলাম যে আমি কলকাতায় পরিচিত হয়ে গেছি, বিশেষত পত্রিকার সম্পাদক মহলে। 'অমৃত' পত্রিকার কমল চৌধুরী মশায়ের সঙ্গে আলাপ হলো ঐ সময়। তিনি বললেন, 'কবিতা দেবেন আমাদের পত্রিকায়। আপনার কবিতা নিশ্চয় ছাপাবো'। অল্প কিছুকাল পরে 'দেশ' সম্পাদক সাগরময় ঘোষ মহাশয়ের সঙ্গেও আলাপ হয়েছিলো। তিনি বলেছিলেন কবিতা দিতে। বিভিন্ন কবি সম্মেলনে যাবার জন্য নিমন্ত্রণ আসতে লাগলো। এমন কি ইউসিস্‌-এ আয়োজিত আমেরিকানদের এক সাহিত্য সম্মেলনে নিমন্ত্রণ ক'রে বসলো। গেলাম সে

সম্মেলনে। সেখানে প্রধানত আমেরিকান কবিদের কবিতা শোনানো হলো। অর্ধেক সময় অতিবাহিত হবার পর পিছনে তাকিয়ে দেখি শক্তিও কখন এসে আমার পিছনেই চুপচাপ ব'সে আছে। উক্ত সম্মেলনে আমেরিকান কবিতার বঙ্গানুবাদও প'ড়ে শোনানো হলো। পড়লেন স্বয়ং অনুবাদকগণ অর্থাৎ বাংলার খ্যাতনামা বৃদ্ধ কবিরা।

কলকাতার অধিকাংশ তরুণ কবির সঙ্গে তখন আমার আলাপ হয়ে গেলো। আলাপ হলো উৎপল বসুর সঙ্গে। উৎপল বসু আলাপ করিয়ে দিলেন তারপদ রায়ের সঙ্গে। তারাপদবাবুর বাড়িতে তখন সন্ধ্যাবেলা দক্ষিণ কলকাতার তরুণ কবিদের একটি সান্ধ্য-বৈঠক হতো। যতদূর মনে পড়ে উক্ত বৈঠকেই শংকর চট্টোপাধ্যায় এবং সুধেন্দু মল্লিকের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। আমি মাঝে মাঝে রাত্রিবেলা তারাপদবাবুর বাড়িতেই শুয়ে থাকতাম।

একদিন তারাপদবাবু বললেন, 'আমার এক বন্ধু আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চায়। যাবেন তার কাছে ? কাছেই সে, বালিগঞ্জে। আমি হেঁটেই যাই।' প্রথম দিন বোধ হয় আমি যেতে রাজি হইনি। পরে আরেকদিন তিনি যখন বললেন তখন রাজি হলাম। হাজরা রোড ধ'রে সিধে পূর্বদিকে হাঁটতে লাগলাম দু'জনে। তারাপদবাবুর কাছে ছোটা আর হাঁটা প্রায় একই ব্যাপার। ফলে অল্প সময়েই পৌঁছে গেলাম। পরিচয় হলো জ্যোতির্ময় দত্তের সঙ্গে।

জ্যোতিবাবু বললেন, 'আপনার কবিতা সম্বন্ধে আমি একটি প্রবন্ধ লিখেছি।[৫] সে-জন্য আপনার সঙ্গে পরিচয় হওয়া দরকার হয়ে পড়েছিলো। প্রবন্ধটি ছাপায় আপনার অমত নেই—এই কথাটি আপনাকে লিখে দিতে হবে।'

এ-কথা আমি লিখে দিয়েছিলাম, তবে প্রথম সাক্ষাতের দিনে নয়, পরে একদিন। প্রবন্ধটি যাতে 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় সেই চেষ্টাই করছিলেন জ্যোতিবাবু। কিন্তু অত দীর্ঘ প্রবন্ধ ছাপতে হলে ক্রমশ ক'রে ছাপতে হবে, এই হেতু সাগরময় ঘোষ মহাশয় ছাপতে রাজি হননি। এ-প্রবন্ধ অনেক পরে 'কৃত্তিবাস' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিলো।[৬]